ওপারে

রেহ্‌নুমা বিন্‌ত আনিস

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

এপারের পাতায়

আমার ফেসবুক-মুভি ৯
সেই ভালোবাসার নদীটি ১১
ঘরে ফেরা ১৬
অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আমি ২২
মৃত্যুচিন্তা ২৩
বাড়ি-পরিবর্তন ২৮
আমি আত্মহত্যা করব! ৩২
আমরা কি আত্মহত্যা করতে পারি? ৩৭
শোনো ৪২
সেই ছেলেটি ৪৫
সপ্তর্ষি ৫১
বিদায়, বন্ধু আমার ৫৫
ভালোবাসা মানে কি ধরে রাখা না ছেড়ে দেয়া? ৫৮
মৃত্যুর আগেই মেরে ফেলা ৬০
লাইসেন্স টু কিল ৬১
কোফতা বানানো ৬৬
ধারণা ৬৯
হে রাহমানের বান্দারা ৭৪
প্রতিযোগিতা ৭৯
উত্তম চরিত্রের মানদণ্ড ৮৪
জীবনে আনি সূর্যের আলোকচ্ছটা ৮৭
প্রস্তুতি ৯১
চাকরি ৯৬
কী করে থাকব? ৯৮
একজন ট্র্যাজিক হিরো ১০১
প্রতিবিম্ব ১০৬
জিসিসি ভাবনা ১১৭

ঘরে ফেরা

বাংলাদেশে দীর্ঘ তিনমাসের ছুটি কাটিয়ে আবুধাবি ফিরেছি। একজন আংকেল গিয়ে আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এসেছেন। বাসার দরজা খুলতেই আমরা দুই ভাইবোন লাফিয়ে ড্রয়িংরুমের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আনন্দে হাত তুলে বলে উঠলাম, 'আহ! কতদিন পর নিজের ঘরে ফিরে এলাম!'

দেখি বাবা আর তার বন্ধুবর পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আংকেল সুটকেস ঘরে ঢোকাতে ঢোকাতে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আহারে! ওরা নিজের দেশ থেকে বিদেশে এসে বলে কিনা 'ঘরে ফিরে এলাম!'

তখন আমার বয়স ১১ আর ছোট ভাই আহমদের বয়স পাঁচ। ঘটনার irony তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না।

যখন প্রথম দেশ ছেড়ে আসি তখন আমার বয়স পাঁচ। আমার ছোটবেলার স্মৃতির শেলফে থরে থরে সাজানো আছে জানালা দিয়ে পারস্য উপসাগরের নীল সবুজে মাখামাখি ঢেউয়ের আন্দোলন; বাবার সাথে সাগরপারে মাছ ধরার জন্য বড়শিতে চিংড়ি গাঁথা। বিশাল মরুভূমির মধ্যখানে ছোট ছোট বাগানে ফুলের শোভা, পাতার ছাঁটের কারুকাজ, আর ফলভারে মাটি থেকে উঠতে না-পারা খেজুর গাছগুলোকে জিইয়ে রাখতে মালিদের অক্লান্ত পরিশ্রম। বাগানে বা রাস্তার আইল্যান্ডে ঝরনার মাঝে রঙের ফোয়ারা আর ছলছল শব্দ; রাস্তায় সাঁ সাঁ করে চলে যাওয়া রং-বেরঙের মার্সিডিজ আর লেটেস্ট মডেলের দামি দামি গাড়ি।

মনে পড়ে স্কুলবাসের জন্য অপেক্ষায় বা বারান্দায় কাপড় শুকাতে দিতে গিয়ে ঘামে ভিজে চুপচুপে হয়ে যাওয়া; আরব-বাচ্চাদের দোলনায় চড়ে আকাশে উড়ে যাবার প্রয়াস; নানান ভাষাভাষীর নানান ভাষার উচ্ছ্বাস আর দীর্ঘশ্বাস। সুকে (বাজারে) কচ্ছপ আর হাঙর বিক্রির দৃশ্য; বাজারে লবণে চিনাবাদাম ভাজার গন্ধ। বিফ খাব না—চিকেন শাওয়ার্মা খাব বলে মন খারাপ করা। লাল-সবুজের সাথে সাদা আর কালো মেলানো একটি পতাকা আর একটি ভিন্ন জাতীয় সংগীতের সুর রক্তে মিশে যাওয়া, আবার লাল-সবুজ পতাকা বুকে নিয়ে স্কুলের ব্যান্ডে নিজের জাতীয় সংগীতের লিড দিতে গিয়ে গর্বে বুক ফুলে ওঠা।

ভোরবেলা ক্রমান্বয়ে আজানের সুমধুর সুর শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার শব্দে জেগে ওঠা। সবচেয়ে বেশি স্মৃতিতে গেঁথে আছে ধু-ধু বালুকাময় সমুদ্রতীরটি আস্তে আস্তে বাগানে বাগানে ভরে ওঠা; সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে স্বদেশী আর পর্যটকদের জন্য

একটি হাঙরমুক্ত বিনোদন-এলাকা রচনা করা; আকাশের মধ্যখানে বিশাল সব ক্রেনের ওঠানামা; আর আবুধাবির সতত পরিবর্তনশীল চেহারার মাঝে শেখ জায়েদের সদিচ্ছা, দৃঢ়সংকল্প আর দেশপ্রেমের চিত্র।

একদিন বিকেলে সমুদ্রতীরে বসে আছি, সামনে সাগরের ঢেউ আর পেছনে আমার ঘরের জানালা দেখতে পাচ্ছি। তখন আমি ক্লাস নাইনে। আবুধাবির কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বাগানগুলো শেষপর্যন্ত মরু আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করেছে—আবহাওয়া ধীরে ধীরে সহনীয় হয়ে আসছে, মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হয়। আরও পরে শুনেছি শীতকাল নামক অচেনা ঋতুর অস্তিত্বও ওখানে সৃষ্টি হয়েছে! তাই তখন আগের তুলনায় অনেক লোকজন সাহস করে প্রয়োজন ছাড়া বিনোদনের জন্যও ঘর থেকে বের হতো। পাশ দিয়ে দুই যুবক হেঁটে যাচ্ছিল। চাটগাঁইয়া ভাষায় কথা বলতে শুনে কান খাড়া হয়ে গেল। চাটগাঁইয়া বলতে অভ্যস্ত না হলেও স্পষ্ট বুঝতাম; কারণ, বাবা-মা নিজেদের মধ্যে এবং আমাদের সাথে এ ভাষাতেই কথা বলত।

তাদের কথা শুনে বুঝলাম একজনের চাকরির মেয়াদ শেষ, দেশে ফিরে যেতে হবে বলে সে দিশেহারা বোধ করছে। অন্যজন তাকে বৃথাই সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে। একপর্যায়ে বন্ধুটি বলল, ‘এত চিন্তার কী আছে? তুমি আজ এত বছর চাকরি করছ, কিছু তো নিশ্চয়ই জমা আছে, তা দিয়ে তুমি কিছু একটা ব্যবসাপাতি শুরু করলে আরামসে চলতে পারবে।’

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যুবক বলল, ‘ভাই, টাকা থাকলে কী আর এত চিন্তা করি?’

বন্ধু বলল, ‘তাহলে তোমার ১৫ বছরের কামাইয়ের পয়সা সব গেল কোথায়?’

‘মায়ের পেটে, বোনের পেটে, আত্মীয়স্বজনের পেটে...।’

‘তাহলে তাদের বলো তোমার এই বিপদের সময় সাহায্য করতে।’

‘আরে ভাই, ওরা সব খেয়ে পেট পরিষ্কার করে ফেলেছে, এখন ওদের ওসব কিছুই মনে নেই, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আমার দুঃখ বোঝার এখন আর কেউ নেই।’

হাঁটতে হাঁটতে ওরা আমাদের শ্রবণসীমার বাইরে চলে গেল। ওদের কথাবার্তা আমাকে অনেকগুলো স্মৃতির অতলে তলিয়ে দিলো।

মনে পড়ল সেই বাংলাদেশি শ্রমিকের কথা—যিনি মাসের পর মাস মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে যখন পরাস্ত হলেন, দাফনের জন্য তাঁর লাশ হাসপাতালের বিছানা থেকে তুলতে গিয়ে দেখা গেল দীর্ঘদিনব্যাপী অসুস্থ-অনড় থাকায় শরীরের শেষ বন্ধনটি অবমুক্ত হওয়ার

অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আমি

কদিন যাবৎ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসবাস করছি। ঘরের তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রী সে. কিন্তু মাইনাস ৪০ ডিগ্রী সে.-এর উপযোগী তিনখানা কম্বল গায়ে পেঁচিয়েও মনে হচ্ছে যেন বরফের প্রাসাদে দিনযাপন করছি। রিখটার স্কেলে ন্যূনতম ৭ মাত্রার ভূমিকম্পটা বন্ধ হচ্ছে না কিছুতেই। মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার মতো ব্যথার ঢেউ প্রবাহিত হচ্ছে শরীরের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুতে। কাশির দমকে মনে হচ্ছে শরীরের ভেতরকার সবকিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। নাক যেন প্রমত্ত নদী। চোখের জানালাটা খুলতে গেলেই কপালের ওপরে গাড়িভাঙা হাতুড়ির চাপ। যেকোনো শব্দই মনে হয় ব্যান্ডের উন্মাতাল গানের মতো শব্দদূষণ। হাত বাড়িয়ে পানির বোতলটা নিতে এক ঘণ্টা চিন্তা করতে হচ্ছে পারব কি না।

বাচ্চাদের কে কোথায় চিন্তা করার মতো শক্তি নেই, মাথার ভেতর সব কেবল গুলিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর তাবৎ খাবার চিরতার মতো বিস্বাদ লাগছে। বই পড়তে পারছি না, টিভি দেখতে পারছি না, কম্পিউটার তো প্রশ্নাতীত। যে-মানুষ ২৪ ঘণ্টা কাজে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে ভালোবাসে তার জন্য এই অখণ্ড অবসর যে কী অসহ্য এক যন্ত্রণা!

হাফিজ সাহেব সেবা বলতে বোঝেন খাবার। নিরলসভাবে নানাবিধ খাবারের ব্যবস্থা করে চলেছেন পাছে বউ মরে গেলে সব কাজ তাঁকেই করতে হয়! কন্যাও পিতাসদৃশ। ভাত মেখে, পেয়ারা কেটে, আমে লবণ-মরিচ মাখিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। পুত্র এসে মাথায় গলায় হাত দিয়ে দেখে জ্বর কমলো কি না, তারপর চরম স্যাক্রিফাইস করে টিভির রিমোটটা আমার হাতে দিয়ে বুঝিয়ে দিলো, আমার জন্য কতটা অনুভব করছে।

আর আমি ভাবছি অন্য কথা। এত কষ্টেও প্রাণটা শরীরটাকে ছেড়ে গেল না। এর চেয়ে অনেক কম কষ্টেই কত আপনজন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়! তাহলে প্রাণটা যেদিন এই শরীরটাকে ত্যাগ করে চলে যাবে সেদিন না-জানি কেমন কষ্ট হবে। আল্লাহ মৃত্যুকে সবার জন্য সহজ করে দিন।

মৃত্যুচিন্তা

১

দুবছর আগে খবর পাই ক্যালগেরিতে একজন বাংলাদেশি বোন ক্যান্সারে আক্রান্ত। দুটি ছোট ছোট সন্তান রেখে তিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তার স্বামী হাসপাতাল আর বাসার মাঝে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন না, সুতরাং ব্যয় অব্যাহত থাকলেও আয় বন্ধ। বলাবাহুল্য অধিকাংশ অভিবাসীর মতো তাদেরও এখানে কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। অসহায় পরিবারটির খবর ছড়িয়ে দিতেই বান্ধবীরা সহযোগিতায় সরব হয়ে ওঠেন, অবশ্যই নীরবে। গত তিন-চার দিন আগে দুই বান্ধবীকে নিয়ে তাকে দেখতে যাই, এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

কথাবার্তার একপর্যায়ে তিনি চিন্তিত হয়ে বলতে শুরু করেন, ‘যদি সুস্থ হয়ে যাই, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ, আর যদি মরে যাই…।’ কথাটা আর আগে বাড়তে দিতে ইচ্ছে হলো না। আমি নেগেটিভিটি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। এসব বিষয়ে আমার একটু সমস্যা আছে। তার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললাম, ‘মরে গেলে কি হবে আপা? কিছুই হবে না! কিছুদিন সবাই কান্নাকাটি করবে, তারপর একসময় সবাই সব ভুলে যাবে, পৃথিবী আবার স্বাভাবিক নিয়মে চলতে থাকবে। আপনার স্বামী আবার বিয়ে করবেন, সন্তানরা বড় হবে, আপনি শুধু স্মৃতি হয়ে রয়ে যাবেন। আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একথাটা সত্য।

আদম ﷺ-এর পর আজ অবধি পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ এসেছেন এবং চলে গেছেন। তাদের অনেকের যোগ্যতা, ক্ষমতা, ধনসম্পদ, জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। কই, তারা আজ কোথায়? আপনার ক্যান্সার তাই আপনি ভাবছেন আপনি মারা যেতে পারেন, কিন্তু এটা তো একটা এক্সকিউজ-মাত্র। আমার তো কিছু হয়নি, কিন্তু আপনি কাল শুনতে পারেন আমি মারা গেছি! মৃত্যু সময়মতো যেকোনো একটা রূপ নিয়ে চলে আসবে। যা অবশ্যম্ভাবী তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে কি কোনো লাভ আছে? বরং যেটুকু সময় আছে তা কাজে লাগানোই যৌক্তিক। আপনি তাঁকেই রোগ-নিরাময়ের জন্য অনুরোধ করুন, যিনি এই রোগ দিয়েছেন। ভেবে দেখুন, আপনি যেভাবে আশা করেন তিনি আপনার কথা শুনবেন, সেভাবে আপনি তাঁর কথা শোনেন কি না। পাশাপাশি স্বামী-সন্তানকে সময় দিন। যেটুকু সময় হাতে আছে, তাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হোন, যেন আপনি চলে গেলেও আপনার সাফল্যের স্বাক্ষর রয়ে যায়। এটা কেমন হয়?’

বাড়ি-পরিবর্তন এবং একটি অভিজ্ঞতা

মনে হচ্ছে যেন টাইটানিক ডুবে যাচ্ছে। পরিণতির পূর্বে এক মুহূর্তের জন্য ভেসে থাকা, অতঃপর সর্বগ্রাসী নৈরাজ্য। পুরাতন বাড়িওয়ালা বাড়ি বিক্রি করে দেয়াতে আট মাসের ব্যবধানে আবার বাড়ি পরিবর্তন করতে হচ্ছে।

আমার মায়ের এবং আম্মার (শাশুড়িমা) দীর্ঘ সংসার-জীবনের পরিক্রমায় সঞ্চিত বস্তুসামগ্রীর পরিমাণ দেখে সংকল্প করেছিলাম—জীবনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি জিনিসেরও মালিক হতে চাই না। বাজারে ঘোরাঘুরি করার কিংবা অহেতুক জিনিসপত্র কেনার অভ্যাস নেই মোটেই; বরং অপ্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে দেয়ার কিংবা দিয়ে দেয়ার অভ্যাস বিদ্যমান। তবু আল্লাহ্ যাকে বরকত দেন, সে কীভাবে জিনিস কমাবে?

শেষদিন পর্যন্ত মনে হচ্ছিল চারিদিক থেকে জিনিস বেরোচ্ছে, কেবল জিনিস আর জিনিস, John Donne-এর A Hymn to God the Father কবিতার মতো—মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি ভয় পাচ্ছেন, তাঁর পাপরাশি তাঁর ধ্বংসের কারণ হবে। তাই তিনি গডের কাছে নিজের পাপমোচন করিয়ে নিয়ে অতঃপর মৃত্যু দান করার আবেদন জানাচ্ছেন। কিন্তু গড যতই পাপরাশি ক্ষমা করে তাঁকে আশ্বস্ত করতে যান, ততই তিনি নিজের নতুন নতুন পাপের তালিকা বের করেন যেগুলো থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত না হলে তাঁর মুক্তি নেই।

ভাবছি, নতুন বাসায় গিয়েই জিনিসগুলো বাছাই দিতে হবে। গতবার বাসা পরিবর্তনের সময় দুই ডাস্টবিন জিনিস ফেলে দিয়েছি এবং অন্তত বিশ-পঁচিশ বস্তা জিনিস দিয়ে দিয়েছি, তবু জিনিস কমে না।

এই সময় খবর পেলাম আমাদের একজন বাংলাদেশি মুরুব্বি মারা গিয়েছেন। আমি চিনি না, হাফিজ সাহেব কোনো একসময় তাঁর নাতনিকে পড়িয়েছেন। ঠিক করলাম, জুম'আ পড়তে গেলে তাঁর জানাজার পর দাফনেও শরিক হব। সেখানে আমরা মহিলারা গেটের বাইরে দাঁড়াই, আমি না-গেলেও চলত, কিন্তু কবরস্থানে গেলে নিজের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক থাকে। তাছাড়া আমার সন্তানদের মৃত্যুর প্রক্রিয়ার সাথে অভ্যস্ত করতে চাইছিলাম। প্রায় জুম'আতেই মাসজিদে জানাজা পড়ানো হয়, কবরস্থানেও ওদের প্রায়ই নিয়ে আসি। কিন্তু এর অন্তর্বর্তী সময়ে কী হয় সে-প্রক্রিয়াটাও ওদের জানা থাকা দরকার। তাই সেদিনই বাসা পরিবর্তন করার কথা থাকলেও দুপুরে সব কাজ ফেলে ছুটলাম।

জুম'আর সময় প্রচুর পরিমাণ ক্রিশ্চান লোকজনের উপস্থিতি দেখে ভাবলাম ওরা হয়তো ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য এসেছে, এখানে প্রায়ই এমন লোকজন ইসলামি অনুষ্ঠানগুলোতে আসে যেন ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। জুম'আ হলো, জানাজা হলো, তারপর আমরা শহরের বাইরে কবরস্থানে রওয়ানা হলাম। ওখানে গিয়েও দেখি ক্রিশ্চান গোষ্ঠী উপস্থিত। কৌতূহলী হলাম। মুসলিম গোরস্থানে ওদের কী উদ্দেশ্যে আগমন? আবার ওরা দেখি ক্যামেরা, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে প্রস্তুত, ছবি তুলবে। মহিলারা দূরে দাঁড়িয়েছিল। যে পরিবারের উদ্দেশ্যে আমরা গিয়েছিলাম, তাঁরা অনবরত দু'আ পড়ছেন।

নিজের দু'আ শেষ করে ক্রিশ্চান পরিবারটির সাথে কথা বলতে গেলাম। দেখলাম মহিলাদের মাঝে রয়েছেন প্রয়াতের স্ত্রী, তাঁর মেয়ে এবং তাঁর ছেলের গার্লফ্রেন্ড—যে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ কেন তাকে তার বয়ফ্রেন্ডের পিতার কবরে নামতে দেয়া হবে না বা অন্তত পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে দেয়া হচ্ছে না। তাকে বোঝালাম, কবরের চারপাশে এতগুলো পুরুষ—আমরা মুসলিম মহিলারা সাধারণত পুরুষদের ভিড়ে যাই না।

প্রয়াতের মেয়েটিকে দেখছিলাম কিছুক্ষণ পরপর বাবাকে যেভাবে দেখেছে সেভাবে মুনাজাত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে জানে না মুনাজাতে কী বলতে হয়। সে জানাল তার বাবা বসনিয়া থেকে এসে সেই পঞ্চাশ বছর আগে এখানে মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন করেন, এখানকার সবচেয়ে বড় মাসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন তিনি। যৌবনে বিয়ে করেছিলেন এক জার্মান ক্রিশ্চান ভদ্রমহিলাকে যিনি তাঁর চার সন্তানের জননী। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেননি, চার সন্তানের মাঝে কেবল একটি পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে, বাকিরা ক্রিশ্চান। তাঁরা সবাই সন্তানাদি নিয়ে এসেছেন কবরে মৃত বাবার ছবি তুলতে, তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু এরা কেউ জানে না কীভাবে বাবা-মায়ের জন্য কিংবা মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে হয়—কারও মাথায় নেই যে, বাবা গত হয়ে গেলেও তাঁর জন্য আজীবন প্রার্থনা করা যায়।

কিছুক্ষণ পর তারা তাঁকে কবরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শুইয়ে রেখে চলে গেল, তাঁর জন্য প্রার্থনা করারও আর কেউ রইল না। তিনি সারাজীবন ইসলামের সেবা করে গেলেন, কিন্তু নিজের একটি সিদ্ধান্ত আজ তাঁকে কবরের কঠিন মাটিতে একা করে দিলো। ফিরে আসার সময় বুকের ভেতর মোচড় দিচ্ছিল এই ভিনদেশী মুসলিম ভাইটির জন্য, যদিও যাওয়া হয়েছিল আরেকটি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে।

বাসায় ফিরে এসে ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততায় নাভিশ্বাস অবস্থা। প্রায় সব জিনিস নতুন বাড়িতে চলে গিয়েছে, তবু যা বাকি আছে তাতেই মাথা খারাপ অবস্থা। যদিও কোনো প্রয়োজন

আমরা কি আত্মহত্যা করতে পারি?

‘আন্টি, আত্মহত্যা করা কি জায়েজ আছে?’

মেয়েটার দিকে তাকালাম। বয়স ১৫/১৬ হবে। স্কিনটাইট জিন্স, হাতাকাটা টি-শার্ট, তার ওপর সি থ্রু ফুলহাতা সোয়েটার শরীরের উপর আঁটসাট হয়ে রয়েছে, ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। ওর ১৭ বছর বয়সি ভাইটা প্রশ্ন শুনে নড়েচড়ে বসল। ওর সদ্য গজানো গোঁফদাড়ির আড়ালে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি।

আমার এক বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে গিয়ে এই পরিবারের সাথে দেখা। ওদের বাবা-মা খুব চিন্তিত ছেলে নামাজ পড়ে না, মেয়ে পর্দা করে না। এই নিয়ে প্রতিদিন বাসায় অশান্তি, ছেলেমেয়েদের সাথে চেঁচামেচি। বেড়াতে এসেও এই নিয়ে সর্বসমক্ষে আলাপ। বিগত ২০ বছরের শিক্ষকতা এবং মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি—বাচ্চাদের সাথে কথা বলার জন্য প্রয়োজন অটুট ধৈর্য, তাদের কথা শোনার খাঁটি আগ্রহ, তাদের বক্তব্যকে পজিটিভলি গ্রহণ করার সংকল্প এবং তাদের কিছু বুঝিয়ে বলার সময় তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রতি সম্মান রেখে যুক্তিগ্রাহ্য উপস্থাপনা। বাচ্চাদের জেরা করলে, তাদের কথায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে, তাদের পাত্তা না-দিলে কিংবা অপদস্থ করলে তারা আপনার কাছ থেকে নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে নেবে; সে খোল আর কিছুতেই খোলা সম্ভব হবে না। এতগুলো মানুষের সামনে ছেলেমেয়েগুলোকে এভাবে পর্যুদস্ত হতে দেখে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ওদের আলাদা ঘরে নিয়ে বসালাম, ওদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বললাম।

ছেলেমেয়ে দুটির সাথে বাক্যালাপের একপর্যায়ে বুঝতে পারলাম, সম্পূর্ণ দোষ ওদের বাবা-মায়ের। এই বেচারারা আল্লাহকে চেনে না, রসুল ﷺ-কে জানে না, ইসলাম কী বা কেন তাদের কোনো ধারণা নেই। বললেই হবে—নামাজ পড়ো, পর্দা করো? বাবা-মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বেচারারা দিনরাত লেখাপড়া করছে, শ্রেয় থেকে শ্রেয়তর রেজাল্ট করার জন্য দিনের আরাম, রাতের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে–এর পেছনে একটা যুক্তি আছে। ভালো লেখাপড়া করে ওরা ভালো ক্যারিয়ার গঠন করবে, অনেক টাকা ইনকাম করবে, তাহলে একটা আয়েশি জীবন পাওয়া যাবে। কিন্তু নামাজ পড়ে, পর্দা করে কী হবে? কেন ওদের বাবা-মা এমন কিছু কাজ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করছেন যার পেছনে কোনো কার্যকারণ নেই? কী করে এই ছেলেমেয়ে-দুটি তাদের বাবা-মায়ের এই অযৌক্তিক আবদার মেনে নেবে?

আমি শ্রোতা হিসেবে উত্তম। ওরা বেশ কিছুক্ষণ মনের ঝাল ঝাড়ল, আমি একাগ্রতার সাথে শুনলাম। তারপর একসময় প্রশ্ন করতে শুরু করল আল্লাহ্ কে, তিনি কেন আমাদের

সৃষ্টি করলেন, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী, কীভাবে এই উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব ইত্যাদি। সাধ্যমতো জবাব দিলাম। তারপর হঠাৎ এই প্রশ্নের অবতারণা।

আমি হেসে বললাম, 'কেন, তুমি আত্মহত্যা করতে চাও?'

মেয়েটি বলল, 'ধরুন, আমি জীবন থেকে যা চাই তা পেলাম না অথবা জীবন আমার কাছে অনেক কঠিন মনে হচ্ছে, তখন কি আমি আত্মহত্যা করতে পারি?'

বললাম, 'তুমি যদি এক কথায় জানতে চাও, তাহলে বলব, পারো না। দেখো, আমাদের এই শরীর আসলে একটি যন্ত্র। তুমি মানে কিন্তু আসলে তোমার আত্মা। তোমার আত্মাকে এই শরীরটি দেয়া হয়েছে যেন সে প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারে। বুঝতে পারছ না? যেমন ধরো, কম্পিউটারের ভেতর যে মাদারবোর্ড আছে সেটা আত্মা, আর বাইরের যন্ত্রাংশগুলো হলো তার শরীর। মূল কাজ মাদারবোর্ডই করে—কিন্তু মনিটর, কী-বোর্ড, মাউস ইত্যাদি ছাড়া তাকে চালানো কঠিন।

তেমনি তুমি মানে আসলে তোমার আত্মাটা, শরীরটা কিন্তু তুমি না, তোমারও না। যে জিনিস তোমার নয়, নৈতিকভাবে তা নষ্ট করার অধিকার তোমার নেই। আত্মহত্যা করলে তোমার আত্মাটাকে তো তুমি মারতে পারছ না, যেহেতু সে অমর; পারছ কেবল শরীরটাকেই ধ্বংস করতে। অথচ তাকে মারার অধিকার তো তোমার নেই! সে কারণেই আত্মহত্যা করা যাবে না। তাছাড়া তোমার জীবনের কিছু উদ্দেশ্য আছে, সেগুলো পূরণ হবার আগে যদি তুমি রণে ভঙ্গ দাও, তাহলে সেটা কাপুরুষোচিত কাজ হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। একইভাবে আত্মহত্যার শাস্তি জাহান্নাম। সেটা কিছুতেই কাঙ্ক্ষিত বাসস্থান হতে পারে না। তখন পস্তাবে, অল্প কষ্ট থেকে বাঁচতে গিয়ে দেখি চিরস্থায়ী কষ্টে পড়ে গেলাম!

'এবার তোমার প্রশ্নে আসি। তোমাদের একটা গল্প বলি, শোনো। আমার এক কাজিন, আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। একদিন দেখি সে বাইরে থেকে এসে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, প্রচণ্ড জ্বর, সেই শয্যা থেকে উঠল সাতদিন পর। মা ওকে জিজ্ঞেস করল, 'ঘটনা কী? কী এমন হলো যে একেবারে সাতদিন তুই নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে বিছানায় পড়ে রইলি?' সে কান্নাকাটি করে বলল, 'আমি একটা মেয়েকে খুব পছন্দ করতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল ওকে বিয়ে করা। সে উদ্দেশ্যে আমি প্রায়ই ওদের বাসায় যাতায়াত করতাম। আমি চাইতাম ওর বাবা-মা যেন আমাকে সুনজরে দেখেন। ওরাও আমাকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু সেদিন গিয়ে দেখলাম ওরা অন্য জায়গায় ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। ওর মায়ের সাথে কথা বললাম, উনি বললেন, ওরা আমাকে ছেলের দৃষ্টিতে দেখেছেন, মেয়ে-জামাই হিসেবে কল্পনা করেননি!' এত বড় ছেলেকে কান্নাকাটি করতে দেখে আমরা ভাইবোনরা মুচকি মুচকি হাসছিলাম।

শোনো

এই যে আপু, শোনো! হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। ও কি, এত তাড়াহুড়ার কী আছে? তোমার যেতে হবে? আমারও তো যেতে হবে! তবে পাঁচ মিনিট শুনেই যাও না। কথা দিচ্ছি তোমার বেশি সময় নেব না আমি। এসো, এখানটায় বসো, তোমার সাথে একটা জরুরি কথা আছে।

কী জরুরি কথা? না, ভয় পেয়ো না। তোমার সিদ্ধান্ত বদলাবার চেষ্টা করব না আমি। তুমি আমার চেয়ে কম বোঝো নাকি? আমি তোমাকে ডেকেছি আমার প্রয়োজনে। তোমাকে একটা অনুরোধ করতে চাচ্ছিলাম। আমার একটা কাজ করে দেবে, ভাই? একটু পর যখন তোমার আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন তাঁকে জানিয়ো, আমি এক্সপ্রেস মেইলে খবর পাঠিয়েছি, তিনি যেন তাঁর অগাধ ক্ষমাশীলতার নিদর্শন হিসেবে আমাকে মাফ করে দেন। এ কি! আঁতকে উঠলে কেন? আমি এমন কী কষ্টের কাজ করতে বললাম তোমায়? তুমি তো রওয়ানা দিয়েছই, তাহলে এটুকু খবর পৌঁছতে পারবে না?

আসলে হয়েছে কি, কী বলব ভাই, লজ্জাই পাচ্ছি বলতে—তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম অবয়বে, নাক-মুখ-চোখ-হাত-পা সব ঠিকঠাকমতো বুঝে পেয়েছি, জ্ঞানবুদ্ধিও খারাপ দেননি, তবু 'থ্যাংক ইউ' বলতে মনে থাকে না। আমার সব প্রয়োজনের দিকে তিনি খেয়াল রাখেন, সব সুবিধা-অসুবিধা দেখেন, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসার পরীক্ষা নিতে গেলেই আমি তাঁর সাথে প্রতারণা করে বসি। তিনি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, আমার প্রতি তাঁর সদা-সচেতন নজর, কিন্তু আমি কেবল ফাঁক পেলেই আমার শত্রুর সাথে প্রেম করে বসি। কী যে করি আপু! বুঝি সবই, তবু যে কেন বারবার পা পিছলে পড়ি! অনেক ভয়ে আছি আপু, কবে তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়, কী লজ্জায় পড়ব তখন, মরারও উপায় থাকবে না! তুমি যেহেতু আগেভাগেই হাজিরা দিতে যাচ্ছ, ভাবলাম নিশ্চয়ই তোমার প্রস্তুতি শেষ। এরকম একটা প্রতিষ্ঠিত মানুষ পেলাম, তাই ভাবলাম তাড়াতাড়ি খবরটা পাঠাই। আমার এটুকু কাজ তোমাকে করে দিতেই হবে!

অ্যাঁ, বলো কী? তোমার প্রস্তুতি নেয়া হয়নি? তাহলে হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছিলে কোথায়? তোমার ওড়না তো এখনো ফ্যানের শোভাবর্ধন করছে! কী? জীবনের প্রতিকূলতা সহ্য করতে পারছ না, তাই রওয়ানা দিচ্ছিলে? পাগল নাকি? কেউ কি সাময়িক জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য চিরস্থায়ী জ্বালা বেছে নেয়? কেন গো আপু, এই যে এতগুলো বছর তুমি জীবনের রং-রূপ-গন্ধ স্পর্শ উপভোগ করলে, কোনোদিন কি বলেছ, 'না না, ব্যস ব্যস, হয়েছে, আর লাগবে না, থ্যাংক ইউ'? তাহলে যিনি তোমাকে এত্ত এত্ত দিলেন, তিনি যদি বাজিয়ে

দেখতে চান তুমি তাঁকে ভালোবাস, না তাঁর উপহার সামগ্রীকে—তখন তুমি ভালোবাসার পরীক্ষায় ফেল মারতে চাও? এমন একজনকে কি তুমি গ্রহণ করতে, যে তোমাকে নয়, তোমার আনুষঙ্গিক বস্তুসামগ্রীকে ভালোবাসে? তাহলে তুমি কী ভেবে এই অবস্থায় তাঁর সামনে উপস্থিত হতে যাচ্ছ?

শোনো আপু, সহজ কথা। শরীরটা তো আর তোমার নয়; বরং একে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তোমার কাছে দেয়া হয়েছে যেন তুমি একে খাটিয়ে পরবর্তী জীবনের জন্য কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারো। ব্যাংকলোনের মতো ব্যাপার। ব্যাংক তোমাকে লোন দেয় কেন? তোমার পুঁজি নেই বলে। ওরা তোমাকে কিছু পুঁজি দিয়ে দেয় যেন তুমি টাকাটা খাটিয়ে লাভ করতে পারো—তোমারও কিছু লাভ হলো, ব্যাংকও তার আসল ফিরে পেল। কিন্তু তুমি যদি লোনের টাকাটা মেরে খেয়ে উড়িয়ে ফেল, তাহলে ব্যাংক কি তোমাকে ছেড়ে দেবে? শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।

সৃষ্টিকর্তা তোমাকে এই শরীর দিয়েছেন বাবা-মায়ের সেবা করার জন্য, স্বামীর হাত ধরে জীবন গড়ার জন্য, তোমার সন্তানদের ভালোবাসার জন্য, গরিব-দুঃস্থদের সাহায্য করার জন্য, বন্ধুদের সহযোগিতা করার জন্য ...। ফ্যানে ঝোলানোর জন্য ... মনে হয় না। তুমি পুঁজি নষ্ট করলে এই শরীরের সৃষ্টিকর্তা তোমাকে চিরস্থায়ী শাস্তিতে দণ্ডিত করলে আমাদের কার কী বলার আছে, বলো। আইন ভঙ্গ করলে আইন কি শাস্তি দেয়ার অধিকার রাখে না?

নাহ, তোমার প্রতি একটু বেশিই কঠিন হয়ে গেলাম মনে হয়। শোনো আপু, আমাদের জীবনে সমস্যা হয় কেন? এগুলো তো আমাদেরই অবিবেচনা, স্বার্থপরতা, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধের ফল। প্রতিটা সমস্যারই সমাধান আছে। কিন্তু আমরা সমাধানের দিকে না-গিয়ে বরং যে-ভুল করে সমস্যায় নিপতিত হয়েছি, সে-ভুলকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই, আর মনে মনে আশা করি, আমাদের প্রভু অলৌকিকভাবে সব পরিবর্তন করে দেবেন।

আচ্ছা আপু, তুমিই বলো, কারও শরীরে রোগ হলে অপারেশন করাতে হয় না? অপারেশন করলে কষ্ট হয় না? তাই বলে কি আমরা সুস্থ হবার আশায় অপারেশন না করিয়ে কষ্ট হবে বলে রোগটাকে লালন করি? তুমি ঠিকই বলছ, একটা প্রতিকূলতাকে সমাধান করতে অনেক অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়, অনেকে না-বুঝে বেদনাদায়ক মন্তব্য করে, শারীরিক-মানসিক প্রচুর চাপ যায়, কোনো কোনো সময় মনে হয় যেন আগুনের মাঝে বসবাস করছি। কিন্তু একদিন হঠাৎ ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামে, গ্রীষ্মের দাবদাহ সরে গিয়ে চারিদিক ঘাস-লতাপাতায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, সেই সবুজের অঙ্গনে নিরাপদ ছাদের নিচে বসে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমরা স্মৃতি রোমন্থন করি, 'আহ, কী কঠিন সময়ের ভেতর দিয়েই-না